بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ মোতাবেক ০৬ তবলীগ, ১৪০৫ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যেমনটি বলেছেন যে, মহানবী (সা.) আমাদের জন্য 'উসওয়ায়ে হাসানা' বা সর্বোত্তম আদর্শ এবং প্রতিটি বিষয়েই তিনি সর্বোত্তম আদর্শ। বিগত খুতবাগুলোতে এই প্রেক্ষাপটেই তাঁর (সা.) খোদাপ্রেমের বিষয় আলোচিত হচ্ছিল। খোদাপ্রেমের উল্লেখের মাঝে তাঁর ইবাদতের আদর্শের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। আমার ধারণা ছিল, খোদাপ্রেমের পর পরবর্তী বিষয় হিসেবে আমি তাঁর ইবাদতের বিষয়টি গ্রহণ করব; কিন্তু যখন খোদাপ্রেমের উল্লেখ আরম্ভ হয়, তখন ইবাদত সংক্রান্ত অনেক ঘটনাও এর মধ্যে চলে আসে। ইচ্ছা সত্ত্বেও আমি এই দুটি বিষয়কে আলাদা করতে পারি নি, কারণ উভয় বিষয় পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। খোদাপ্রেম ছাড়া ইবাদত হয় না, আর ইবাদত ছাড়া খোদাপ্রেম সম্ভব নয়। যদি আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা না থাকে, তবে প্রকৃত ইবাদত হতেই পারে না। যাহোক, এই প্রসঙ্গে আজ আমি আরো কিছু বর্ণনা করব; যদিও তা আমি ইবাদতের সূত্রে নিয়েছি, কিন্তু যেমনটি আমি গত খুতবাতেও বর্ণনা করেছিলাম, এর শেষ বা চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসাতেই গিয়ে পৌঁছে।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (সা.) ভালোবাসার এই মানকে পবিত্র কুরআনে যেভাবে বর্ণনা করেছেন, গত খুতবাগুলোতে একটি উদ্ধৃতি তথা একটি আয়াতের বরাতে আমি তার ব্যাখ্যা করেছি। আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (সূরা আল-আন'আম: ১৬৩) অর্থাৎ "তুমি বলে দাও, 'আমার ইবাদত, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও আমার মরণ আল্লাহ্রই জন্য, যিনি সকল জগতের প্রভু'।"

যেমনটি আমি বলেছি, এই আয়াতের ব্যাখ্যা তো বিগত খুতবাগুলোতে চলে এসেছে, তাই পুনরায় তা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ তা'লা এরপর তাঁকে (সা.) فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ (সূরা আলে ইমরান: ৩২) ঘোষণা দিতে বলে আমাদেরকেও সেসব মান অর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মানুষকে জানিয়ে দাও– যদি তোমরা আমার অনুসরণ করো, তবে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমরা আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা লাভ করতে পারবে। অতএব, তাঁকে (সা.) এই ঘোষণা দিতে বলে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও সেসব মান অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমরা তা অর্জনের জন্য প্রকৃত চেষ্টা করি।

ইবাদত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মাধ্যমে আমাদেরকে অসংখ্য নির্দেশনা দিয়েছেন। এক জায়গায় তিনি বলেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ (সূরা আয-যারিয়াত: ৫৭) অর্থাৎ "আর আমি জিন ও মানুষকে কেবল এ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে।"

সুতরাং তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যদি তোমরা আমার অনুসরণ করতে চাও, তবে শোনো– আমি যেভাবে মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য উপলব্ধি করেছি, তোমরাও তা অনুধাবন

করো এবং এর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের চেষ্টা করো। তবেই তোমরা নিজেদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণে সমর্থ হবে আর তবেই তোমরা আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা লাভ করতে পারবে।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা ইবাদতের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে এক স্থানে বলেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (সূরা আল-বাকারা: ২২) অর্থাৎ "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রভুর ইবাদত করো যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকেও, যারা তোমাদের পূর্বে ছিল, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো।"

অতএব, আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ করা এবং তাকওয়া অবলম্বন করার জন্য আবশ্যক হলো আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা এবং তাঁর ইবাদতের মানকে সুউচ্চ করা।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (সূরা আল-হাজ্জ: ৭৮) অর্থাৎ "হে যারা ঈমান এনেছ! রুকু করো, সিজদা করো এবং তোমাদের প্রভুর ইবাদত করো ও ভালো কাজ করো, যেন তোমরা সফলকাম হতে পারো।"

সুতরাং মহানবী (সা.) যেমন আমাদেরকে এই নির্দেশাবলি প্রদান করেছেন, তেমনিভাবে তিনি নিজের আদর্শ বা কর্মের মাধ্যমে এর চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠাও প্রদর্শন করেছেন এবং এরপর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, প্রকৃত আনুগত্য ও অনুসরণ তখনই হবে, যখন তোমরা নিজেদেরকে সেই মানে উন্নীত করার চেষ্টা করবে। তাঁর সেসব দোয়া যা তিনি তাঁর উম্মতের জন্য করেছিলেন– তা তখনই আমাদেরকে আচ্ছাদিত করবে এবং আমাদের জন্য কল্যাণকর সাব্যস্ত হবে, যখন আমরা তাঁর (সা.) আদর্শ ও নির্দেশাবলিকে সর্বদা দৃষ্টিপটে রেখে তা পালন করার চেষ্টা করব। কেবল লোক-দেখানো ভাব এবং মৌখিক দাবিতে কোনো কল্যাণ লাভ করা যায় না।

যাহোক, তিনি যেসব আদর্শ স্থাপন করেছেন, তন্মধ্যে অনেক দৃষ্টান্ত তো আমি উল্লেখ করেছি; আরো কিছু দৃষ্টান্ত রয়েছে যা এখন উপস্থাপন করছি।

তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের কোনো সুযোগ হাতছাড়া হতে দিতেন না; বরং ঘুমের মধ্যেও ইবাদত চলমান থাকত। যেমনটি তিনি নিজেই বলেছেন, "আমার চোখ তো ঘুমায়, কিন্তু আমার হৃদয় আল্লাহ্ তা'লার স্মরণ ও ইবাদত থেকে উদাসীন হয় না।"

তিনি তাঁর অনুসারীদেরও এই উপদেশ দিয়েছেন যে, তোমাদের মান এমন হওয়া উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা তোমাদের দৃষ্টিপটে থাকেন। নিজের ইবাদতের বিষয়ে তিনি কতটা সূক্ষ্মভাবে আত্মজিজ্ঞাসা করতেন, সে সম্পর্কে একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন: মহানবী (সা.) এমন একটি চাদরে নামায পড়লেন যাতে নকশা আঁকা ছিল। তিনি সেটির নকশাগুলোর দিকে একনজর দেখলেন। যখন তিনি নামায শেষ করেন তখন বলেন, "আমার এই চাদরটি আবু জাহমের কাছে নিয়ে যাও এবং আবু জাহমের কাছ থেকে 'আম্বিজানি লুই' (অর্থাৎ নকশাবিহীন সাদামাটা চাদর) নিয়ে এসো। কারণ এটি এক্ষুনি নামাযে আমার মনোযোগে বিঘ্ন ঘটিয়েছে।"

অর্থাৎ সামান্য দৃষ্টিও যখন এর ওপর পড়ল, তখন তিনি (সা.) এটি সহ্য করতে পারলেন না যে, আমি এই চাদরটির দিকে তাকাব আর আমার মনোযোগ আল্লাহ্ তা'লার দিক থেকে সরে যাবে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, "আমি

আমি নামাযরত অবস্থায় এর নকশাগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিলাম; তাই আমার আশঙ্কা হলো, এটি আবার আমাকে পরীক্ষায় না ফেলে দেয়!"

এর ব্যাখ্যায় সৈয়্যদ যয়নুল আবেদীন ওয়ালিউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব লিখেছেন, এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হলো, পোশাক-পরিচ্ছদ যেন সাদামাটা হয়। তাতে এমন চাকচিক্য যেন না থাকে যা মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে দেয়। মানসিক উৎকর্ষ সাধনের সাথে সাথে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই অনাড়ম্বরতার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। তিনি লেখেন, আজকালও আমরা দেখি, রুচিবান ব্যক্তিরা পোশাক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণ রঙকে প্রাধান্য দেন। কিন্তু আজকাল এমন কিছু লোকও আছে যারা (নামাযে) নিজেদের কাপড়ের দিকে তাকাতে থাকে এবং কাপড়ের ইস্ত্রি ঠিক করার দিকে তাদের মনোযোগ থাকে। অথচ নামাযে তো পুরো মনোযোগ আল্লাহ্‌র প্রতি হওয়া উচিত, কোনো কাপড়ের দিকে নয়।

এরপর তিনি লেখেন, নামাযে পূর্ণ একাগ্রতার প্রয়োজন রয়েছে; অর্থাৎ নামায তখনই প্রকৃত নামায হতে পারে যখন মানুষ তাতে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়ে এবং নিবিষ্টচিত্তে নামায পড়ে। এজন্যই ইসলামের শরীয়ত আনয়কারী (সা.) নামায আদায়কারীর আশেপাশে এমন প্রতিটি জিনিসের অস্তিত্বকে অপছন্দ করেছেন, যা তার মনোযোগ সেটির দিকে আকর্ষণ করে। এর দ্বারা বুঝা যায়, তিনি (সা.) কতটা গভীর মনোযোগের সাথে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করতে চাইতেন যেন এমন কোনো জিনিসের ওপর সামান্য দৃষ্টিও না পড়ে যা আল্লাহ্ তা'লার দিক থেকে মনোযোগ সরিয়ে দিতে পারে। আর এ বিষয়ে বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, (সামনে) ছবি থাকা উচিত নয়, সামনে ছবিযুক্ত কাপড় থাকা উচিত নয় এবং সামনে এমন কোনো পর্দা থাকা উচিত নয় যার ওপর ছবি আঁকা রয়েছে। কারণ এই সব জিনিস নামাযে মনোযোগ বিঘ্নিত করার কারণ হতে পারে। এজন্য এগুলো থেকে বারণ করা হয়েছে। নামায পড়ার সময় এমন কোনো পর্দা বা ছবি সামনে থাকা উচিত নয় যার দিকে মুখ ফেরালে মনোযোগ বিচ্যুত হয়। এসব জিনিস কিবলার দিকে থাকা উচিত নয়।

একইভাবে তাঁর (সা.) উন্নত মানের (জীবনাদর্শের) আরো একটি উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত জা'ফর বিন মুহাম্মদ (রা.) নিজ পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনার ঘরে মহানবী (সা.)-এর বিছানা কেমন ছিল? তিনি বলেন, তা ছিল চামড়ার, যার ভেতরে খেজুর গাছের আঁশ ভরা থাকত। হযরত হাফসা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনার ঘরে মহানবী (সা.)-এর বিছানা কেমন ছিল? তিনি বলেন, তা ছিল পশমের। [অর্থাৎ জীবজন্তুর পশম দিয়ে তৈরি নরম বিছানা।] আমি সেটিকে দুভাঁজ করে বিছিয়ে দিতাম ফলে তা কিছুটা নরম হতো এবং মহানবী (সা.) তার ওপরে ঘুমাতেন। এক রাতে আমি ভাবলাম, কেন এটি চার ভাঁজ করে বিছিয়ে দিচ্ছি না যেন এটি আরো বেশি নরম ও আরামদায়ক হয়? তাহলে এটি তাঁর (সা.) জন্য অধিক প্রশান্তির কারণ হবে। তাই আমি সেটি চার ভাঁজ করে বিছিয়ে দিই। সকাল হলে তিনি (সা.) বলেন, তুমি রাতে আমার জন্য কী বিছিয়েছিলে? হযরত হাফসা (রা.) বলেন, আমি নিবেদন করি, সেটি আপনারই বিছানা ছিল, আমি সেটিকে কেবল চার ভাঁজ করে দিয়েছিলাম যেন আপনার জন্য তা অধিক আরামদায়ক হয়। তিনি (সা.) বলেন, এটিকে আগের মতোই থাকতে দাও, কেননা এটির অতিরিক্ত কোমলতা রাতে আমার নামাযের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। যদিও নরম বিছানা তাঁর ইবাদতের পথে বাধা হওয়া সম্ভব নয়, তবুও তিনি (সা.) এমন চিন্তাও পছন্দ করেন নি যে, 'বিছানা নরম হবার কারণে আরেকটু

শুয়ে থাকব এবং আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের জন্য উঠব না; আর এতে (তথা বিছানায়) আমি কোমলতা অনুভব করেছি'। এটিই ছিল তাঁর উচ্চতম মান। তাঁর ইবাদতকালীন অবস্থার চিত্র উম্মুল মু'মিনীন হযরত সওদা (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, আমি একবার মহানবী (সা.)-এর পেছনে নামায পড়ি আর তিনি এত দীর্ঘ রুকু করেন যে, আমি নিজের নাক চেপে ধরি। [অর্থাৎ এত দীর্ঘ রুকু ছিল যে, আমার ভয় হচ্ছিল– পাছে নাক দিয়ে আবার রক্ত ঝরতে আরম্ভ করে!] যাহোক, এই অবস্থা কেবল তখনই সম্ভব যখন এমন ভালোবাসা থাকে যে, প্রিয়তমের দুয়ার ছাড়তে মানুষের মন চায় না। যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, সে তাতেই নিমগ্ন হয়ে যায়।

একইভাবে ইবাদতের মান সম্পর্কে অপর একটি রেওয়ায়েত মুতাররিফ তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে এমন অবস্থায় নামায পড়তে দেখেছি যে, কান্নার কারণে তাঁর বক্ষ থেকে জাঁতাকল পেষার মতো শব্দ আসছিল। [অর্থাৎ যেভাবে জাঁতা বা গ্রাইন্ডার চলে, তেমন শব্দ হচ্ছিল।] অন্য এক স্থানে ফুটন্ত হাঁড়ির উদাহরণও দেওয়া হয়েছে। এরপর আরেক রেওয়ায়েতে এসেছে, হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা.) বর্ণনা করেন, আমি বাহনে মহানবী (সা.)-এর পেছনে বসা ছিলাম, আমার এবং তাঁর মাঝে হাওদা বা জিনের পেছনের অংশটি ছিল। তিনি বলেন, হে মু'আয বিন জাবাল! আমি বলি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি উপস্থিত এবং এটি আমার সৌভাগ্য। তারপর তিনি কিছুক্ষণ চলতে থাকেন এবং পুনরায় বলেন, হে মু'আয বিন জাবাল! আমি পুনরায় নিবেদন করি, লাব্বাইক ইয়া রসূলাল্লাহ্! এটি আমার সৌভাগ্য। এরপর তিনি কিছুক্ষণ চলতে থাকেন এবং আবারও বলেন, হে মু'আয বিন জাবাল! আমি নিবেদন করি, লাব্বাইক ইয়া রসূলাল্লাহ্, এটি আমার সৌভাগ্য। তিনি বলেন, তুমি কি জানো, বান্দার ওপর আল্লাহ্‌র কী অধিকার রয়েছে? আমি বলি, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। তিনি (সা.) বলেন, বান্দার ওপর আল্লাহ্‌র অধিকার হলো, সে যেন তাঁরই ইবাদত করে এবং কাউকে তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত না করে। এরপর তিনি কিছুক্ষণ চলতে থাকেন এবং বলেন, হে মু'আয বিন জাবাল! আমি বলি, লাব্বাইক ইয়া রসূলাল্লাহ্, এটি আমার পরম সৌভাগ্য। তিনি বলেন, তুমি কি জানো আল্লাহ্‌র ওপর বান্দার কী অধিকার রয়েছে, যখন তারা এমন করে [অর্থাৎ ইবাদতকারী বান্দা হয়]? [পূর্বে আল্লাহ্‌র অধিকারের কথা ছিল, এখন বান্দার কী অধিকার রয়েছে– তা বলছেন।] আমি বলি, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলই ভালো জানেন। তিনি বলেন, তা হলো, তিনি যেন তাদের আযাব না দেন। [অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা বান্দাদের যেন আযাব না দেন।] অতএব, তিনি (সা.) কেবল নিজের ব্যক্তিগত আদর্শই প্রতিষ্ঠা করেন নি, বরং সেই আদর্শ অবলম্বনের জন্য উপদেশও দিয়েছেন যে, তোমরাও যদি এমনটি করো তাহলে আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসাও লাভ করবে এবং আল্লাহ্ তা'লার শাস্তি থেকেও রক্ষা পাবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর প্রশংসায় এক স্থানে বলেন:

মহানবী (সা.) পবিত্র কুরআন প্রচারের জন্য আদিষ্ট ছিলেন, তেমনিভাবে সুন্নত প্রতিষ্ঠার জন্যও প্রত্যাদিষ্ট ছিলেন। অতএব, পবিত্র কুরআন যেমন সুনিশ্চিত, তেমনিভাবে নিরবিচ্ছিন্ন ধারায় চলে আসা সুন্নতও সুনিশ্চিত। [অর্থাৎ এমন সুন্নত, যার ধারাবাহিকতা মহানবী (সা.) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে এবং তাঁর ব্যবহারিক আমল দ্বারা সাব্যস্ত হয় এবং মুতাওয়াতের তথা বর্ণনাকারীরা ধারাবাহিকভাবে তা বর্ণনা করে আসছেন, রেওয়ায়েতের একটি শৃঙ্খল বিদ্যমান।] এই উভয় সেবা মহানবী (সা.) নিজ হাতে সম্পাদন করেছেন

এবং উভয়টিকে নিজের জন্য অবশ্য কর্তব্য জ্ঞান করেছেন। যখন নামাযের আদেশ হলো, তখন মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার এই বাণী নিজের কর্ম দ্বারা বিশদভাবে বুঝিয়ে দেন এবং ব্যবহারিকভাবে দেখিয়ে দেন যে, ফজর নামায এই কয় রাকআত আর মাগরিবের এত এবং অন্যান্য নামায এত রাকআত। একইভাবে হজ্জ পালন করেও দেখিয়ে দেন এবং এরপর নিজের হাতে হাজার হাজার সাহাবীকে এই কার্যে অভ্যস্ত করে ব্যবহারিক কর্মের ধারা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রতিষ্ঠিত করেন। [নিজে করে দেখান, এরপর তাদেরকে এই বিষয়ে অভ্যস্তও করেন।] কাজেই, যে ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত আজ অবধি উম্মতের মাঝে অনুসৃত কর্মপন্থা হিসেবে দৃশ্যমান ও প্রতীয়মান, এরই নাম সুন্নত। তিনি (আ.) আরো লেখেন, কিন্তু হাদীস মহানবী (সা.)-এর সামনে লেখা হয় নি এবং তা সংকলন করার জন্য (সে সময়) কোনো বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি।

যাহোক, তিনি (আ.) সুন্নত ও হাদীসের মাঝে তুলনা করছিলেন যে, এই দুয়ের মাঝে পার্থক্য কী। তিনি (আ.) বলেন, সুন্নতের স্থান আগে এবং হাদীসের স্থান পরে; আর যে হাদীস পবিত্র কুরআন এবং তাঁর সুন্নতের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, সেই হাদীস সহীহ্ বা সঠিক। অতএব, যেখানে তিনি (আ.) মহানবী (সা.)-এর প্রশংসায় একথা বলছেন যে, তাঁর ইবাদতের মান কেমন ছিল, সেখানে এটিও বলে দিয়েছেন যে, তিনি (সা.) এসব কিছু করে দেখিয়েছেন এবং নিজের অনুসারীদের এগুলোর ওপর আমল করার উপদেশ দিয়েছেন এবং তাঁদের দিয়ে আমল বা অনুশীলনও করিয়েছেন। অতএব, এটিই সেই সুন্নত যা আজ অবধি আমাদের কাছে পৌঁছেছে। সাহাবীদের যে আদর্শ আমাদের কাছে পৌঁছেছে, তা মহানবী (সা.)-এর তরবিয়তের কল্যাণেই সম্ভব হয়েছে। তিনি (সা.) সাহাবীদের এমন তরবিয়ত করেছেন যে, তাঁদের ইবাদতের মানও উচ্চ থেকে উচ্চতর হতে থেকেছে এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁদের ভালোবাসার মানও ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থেকেছে। এটিই সেই আদর্শ যা তিনি (সা.) প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা তাঁর সাহাবীরা অবলম্বন করেছেন আর আমাদের জন্যও এটিই নির্দেশ।

তিনি (সা.) তাহাজ্জুদ সম্পর্কে অনেক তাগিদ দিয়েছেন, তাহাজ্জুদ পড়া উচিত। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এর তফসীরে এক স্থানে লিখেছেন, মহানবী (সা.)-এর এসব নফলের প্রতি এতটাই খেয়াল ছিল যে, নফল হওয়া সত্ত্বেও তিনি রাতে ঘুরে ঘুরে দেখতেন, সাহাবীদের মধ্যে কারা এই নফল পড়ছে। [অর্থাৎ শহরের অলিগলি এবং রাস্তাঘাটে ঘুরতেন, তখন বুঝতে পারতেন কোথা থেকে নামাযের শব্দ ভেসে আসছে, তাহাজ্জুদের সময় কারা জেগেছে এবং কারা পড়ছে না।] অর্থাৎ তিনি এই বিষয়েও খোঁজ নিতেন যে, কে তাহাজ্জুদ পড়ছে আর কে পড়ছে না। আজকাল যদি কাউকে নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় বা এটিই বলা হয় যে, 'মসজিদে গিয়ে নামায পড়া উচিত, মসজিদে কয় বেলা নামাযে আসো'– তখন এতে মানুষের আপত্তি করা শুরু হয়ে যায় যে, 'এটি আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার; আমাদেরকে জিজ্ঞেস করার তোমরা কে? এই প্রশ্ন করার জামা'তের কী প্রয়োজন? এটি আমাদের এবং আল্লাহ্ তা'লার বিষয়'। কিন্তু মহানবী (সা.) তো স্বয়ং তাহাজ্জুদ নামাযেরও তদারকি করতেন। একবার তাঁর বৈঠকে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-র উল্লেখ করা হয় যে, তিনি খুব ভালো এবং তার মাঝে অমুক অমুক গুণ রয়েছে। তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, সে ভালো মানুষ বটে, শুধু যদি তাহাজ্জুদ পড়ত! তিনি যেহেতু যুবক ছিলেন এবং তাহাজ্জুদে অলসতা করতেন সেজন্য তিনি (সা.) তাকে এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা সেই দম্পতির

প্রতি দয়া করুন, যদি রাতে স্বামীর ঘুম ভাঙে তাহলে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং স্ত্রীকেও জাগায় যে, 'তুমিও উঠে তাহাজ্জুদ পড়'। যদি সে না ওঠে তাহলে তার মুখে পানির ছিটা দেয় এবং জাগায়। একইভাবে যদি স্ত্রীর ঘুম ভাঙে তাহলে সে নিজেও তাহাজ্জুদে পড়ে এবং স্বামীকেও জাগায়। আর যদি সে না ওঠে তাহলে তার মুখে পানির ছিটা দেয়। লক্ষ্য করে দেখো, একদিকে রসূলুল্লাহ্ (সা.) স্ত্রীর জন্য স্বামীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন অত্যন্ত জরুরি আখ্যায়িত করেছেন, অন্যদিকে তাহাজ্জুদে জাগানোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনে পানির ছিটা দিতে হলে সেটাকেও বৈধতা দিয়েছেন। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাহাজ্জুদ নামাযকে এতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। পবিত্র কুরআন বলে, রাতে ওঠা আত্মাকে সুশৃঙ্খল করে। এই কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবীদেরকে বলতেন, যদি দুই রাকআতও হয় তবুও তাহাজ্জুদ অবশ্যই পড়। হাদীস থেকে এটিও প্রমাণিত, রাতের শেষ অংশে আল্লাহ্ তা'লা নিকটবর্তী হয়ে যান এবং অনেক বেশি দোয়া গ্রহণ করেন। এজন্য তাহাজ্জুদ পড়া অত্যন্ত জরুরি ও খুবই উপকারী। এতে সন্দেহ নেই যে, খোদা তা'লার অনুগ্রহের ফলেই নাজাত (মুক্তি) লাভ হয়। কোনো ব্যক্তি নিজ কর্মের ভিত্তিতে দাবি করতে পারে না যে, সে মুক্তি পাবে। কেননা, সবচেয়ে বড়ো ধার্মিক এবং খোদার সবচেয়ে অনুগত ছিলেন মুহাম্মদ (সা.)। তিনিও নিজের কর্মের ওপর ভরসা করতেন না। যেভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এবং গত খুতবাতেও বর্ণনা করেছি, রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আয়েশা (রা.) এবং অন্য আরো সাহাবীদেরকেও এটিই বলেছেন, যখন তারা জিজ্ঞেস করেছে যে, আপনি তো নিজ আমলের কল্যাণে বেহেশতে যাবেন। তখন তিনি (সা.) বলেছেন, না, আয়েশা! আমিও খোদার অনুগ্রহেই যাব। সুতরাং যখন মুহাম্মদ (সা.)-এর ন্যায় মানুষ, যাঁর প্রতিটি নিশ্বাস, যাঁর চলাফেরা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাঁর নিদ্রাযাপন ও জাগ্রত হওয়া ইবাদত গণ্য হতো, যাঁর প্রতিটি গতি ও স্থিতি ইবাদত ছিল, এমনকি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যাওয়া এবং স্ত্রীদের কাছে যাওয়াও ইবাদত ছিল; এত বড়ো ইবাদতকারী মানুষ যখন বলেন, 'আমিও নিজের কর্মের ফলে বেহেশতে যাব না বরং খোদার অনুগ্রহে যাব'– তাহলে আর কে রয়েছে যে বলতে পারে, 'আমি নিজ কর্মবলে বেহেশতে প্রবেশ করব'? এটা মনে কোরো না যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতিটি কাজ কীভাবে ইবাদতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এটা এভাবে, কেননা তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা এটি বলে দিয়েছেন, তাঁর প্রতিটি অবস্থা ইবাদত ছিল। অজ্ঞ ব্যক্তি বলতে পারে, মহানবী (সা.)-এর প্রতিটি কাজ কীভাবে ইবাদত হয়ে গেল? কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত– এটি একেবারে সঠিক কথা যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতিটি কাজ ইবাদত ছিল। তবে তিনি (সা.) ব্যতীত আর কারো প্রতিটি কাজ ইবাদত হতে পারে না। তিনি (সা.) 'উসওয়ায়ে হাসানা' তথা সর্বোত্তম আদর্শ। এজন্য তাঁর প্রতিটি কাজ খোদার সন্তুষ্টির জন্য ছিল। আর যে কাজ খোদার সন্তুষ্টির জন্য হয়ে থাকে সেটি ইবাদতে পরিণত হয়। অন্য কারো প্রতিটি কাজ ইবাদত হতে পারে না। মহানবী (সা.) সম্পর্কে খোদা বলেছেন, لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (সূরা আহযাব: ২২)

তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতিটি কাজে একটি আদর্শ রয়েছে। এর অর্থ কি এটি নয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজের কর্ম দ্বারা বলে দেবেন যে, কোন কাজটি বৈধ এবং কোনটি অবৈধ, কোনটি পছন্দনীয় আর কোনটি অপছন্দনীয়, কোনটি হালাল আর কোনটি হারাম? সুতরাং রসূল করীম (সা.)-এর প্রতিটি কাজই একটি বিবরণ। যেমন তাঁর (সা.) নামায পড়া শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার একটি আদেশ পালনই ছিল না বরং এই কথার ঘোষণা ছিল যে, এগুলো হচ্ছে ফরয আর এগুলো হচ্ছে সুন্নত, আর এগুলো হচ্ছে নফল যা

ফরযের বাহিরে অতিরিক্ত নামায আর যে নামাযগুলো আদায় করা খোদা তা'লার নৈকট্য লাভের জন্য আবশ্যক। তাঁর (সা.) খাবার খাওয়া এই কথার ঘোষণা ছিল যে, তিনি (সা.) যা কিছু খেতেন তা হালাল আর যে জিনিসগুলো তিনি (সা.) খেতেন না তা খাওয়ার অনুপযুক্ত। সুতরাং রসূল করীম (সা.)-এর প্রতিটি কাজকে যেহেতু মানুষের জন্য আদর্শ বানানো হয়েছিল, তাই তিনি (সা.) যে জিনিসগুলোকে বৈধ আখ্যা দিতেন এবং ব্যবহার করতেন তা ইবাদত ছিল। অনুরূপভাবে যেগুলো সম্বন্ধে নিষেধ করতেন এবং নিজেও সেগুলো ব্যবহার করতেন না তা-ও ইবাদতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। মোটকথা, তাঁর (সা.) প্রতিটি কাজই ছিল ইবাদত, কেননা সেগুলো খোদা তা'লার নির্দেশের অধীন ছিল। এর একটি উদাহরণ হলো, একবার এক ব্যক্তি আসরের নামাযের সময় জিজ্ঞাসা করল। একথা স্পষ্ট যে, প্রথম সময়ে নামায পড়া পছন্দনীয়, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.) নামায পড়তে এত দেরি করলেন যে, নামাযের সময় খুবই কম অবশিষ্ট ছিল। তাঁর (সা.) নামাযের ক্ষেত্রে এই দেরি করাও একটি ইবাদত ছিল। তা কেন? তা এই জন্য যে, তিনি (সা.) এর মাধ্যমে এই শিক্ষাই দিচ্ছিলেন যে, কোনো মানুষ যদি কখনও কোনো কারণে প্রথম সময়ে নামায পড়তে না পারে আর সে যদি শেষ সময়ের ভেতরও নামায পড়ে নিতে পারে, তাহলেও তার নামায হয়ে যাবে। মোটকথা, তাঁর (সা.) ফরয নামায, ওয়াজিব নামায এবং নফল ও সুন্নত নামাযসমূহেও এই ঘোষণা ছিল যে, এগুলো সবই হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত। এই অবস্থা সত্ত্বেও তিনি (সা.) বলেছেন, তিনিও আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহেই বেহেশতে যাবেন। অর্থাৎ তাঁকে আল্লাহ্ তা'লা এ কথা বলে দিয়েছেন যে, তাঁর সকল আমলই ইবাদত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি (সা.) এটিই বলেছেন যে, আমি তো আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের কল্যাণেই বেহেশতে যাব। তাহলে আমরা– যাদের আমল এতো নগণ্য– তারা এ কথা কীভাবে বলতে পারি যে, আমরা আমাদের আমলের মাধ্যমে বেহেশতে চলে যাব?

এর মাধ্যমে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, অনুগ্রহ কতটা জরুরি বিষয়। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহও কেবল দাবির মাধ্যমে লাভ হতে পারে না। এটি লাভ করার জন্যও কিছু বিষয় প্রয়োজন। শুধুমাত্র ঈমানের দাবি করলেই কিছু হয় না। আর (অনুগ্রহ লাভের) সেই বিষয়টি কী? সেটি হচ্ছে আমল। মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের ওপর আমল করা বা আমল করার চেষ্টাপ্রচেষ্টা করা, নিজের ইবাদতের মান উঁচু করার চেষ্টা, আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা লাভ করার চেষ্টা। এটি তখনই হবে যেভাবে আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে, ইবাদত খোদাপ্রেম ব্যতীত নয় আর খোদাপ্রেমও ইবাদত ব্যতীত নয়। রসূল করীম (সা.)-এর দোয়ার মান বা অবস্থা কেমন ছিল এ সম্পর্কেও হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর তফসীরের এক স্থানে লিখেছেন; [কিছু অংশ আমি নিজের ভাষায় বলব, তবে সেগুলোও সেখান থেকেই নেওয়া হয়েছে;] তিনি (রা.) বলেন:

এমন অনেক মানুষ রয়েছে যারা দোয়া করে বটে, কিন্তু তাদের চোখ, তাদের মন, তাদের মস্তিষ্ক এবং তাদের হৃদয় তাদের দোয়ার সাহায্যকারী হয় না। তারা দোয়া করে ঠিকই কিন্তু তাদের চোখ অন্য কোথাও থাকে, তাদের মন অন্য কোথাও থাকে, তাদের মস্তিষ্ক অন্য কোথাও ঘুরে বেড়ায়, তাদের হৃদয়ে সেই ভালোবাসা থাকে না যা থাকা প্রয়োজন। খোদা তা'লার জন্য সেই ভালোবাসা থাকে না। আর এর পরিণাম বা ফলাফল কী হয়ে থাকে? এর ফলাফল এটিই হয়ে থাকে যে, যেহেতু এই বিষয়গুলো তাদের দোয়ার সাথে সাথে ক্রিয়াশীল থাকে না বা সেটিকে সাহায্য করে না, তাই সেই দোয়া কেবল এক

কৃত্রিম দোয়াই হয়ে থাকে। তাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয় না, তাদের হৃদয় বিগলিত হয় না। দোয়া করার সময় তো চোখ অশ্রুসিক্ত হওয়া উচিত, হৃদয় বিগলিত হওয়া উচিত, মনমস্তিষ্ক একাগ্রচিত্তে খোদা তা'লার প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। আর তাদের বক্ষ যতক্ষণ সেই উদ্দীপনার সাথে টগবগ না করে ততক্ষণ সেই দোয়ার ফলাফল এটিই দাঁড়ায় যে, তাদের দোয়া সেভাবেই বাতাসে উড়ে যায় যেভাবে ধুলোবালি বাতাসে উড়ে যায়। রসূল করীম (সা.)-এর চেয়ে বেশি স্বাধীনচেতা এবং তাঁর চেয়ে বেশি সম্মানিত আর কে হতে পারে? কিন্তু তাঁর সম্পর্কেও এটি বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (সা.) যখন দোয়া করতেন তখন অনেক সময় তাঁর বক্ষ থেকে এমন শব্দ বের হতো যেন কোনো হাঁড়িতে ফুটন্ত পানি টগবগ করছে। তিনি (সা.) এত বেশি কাঁদতেন যে, তাঁর পবিত্র দাড়ি ভিজে যেত। কিন্তু অনেক মানুষ আছে, যারা নিজেদের অভ্যাস অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লার সাথেও অহংকার করে এবং দোয়ার সময় ক্রন্দন করাকে অপছন্দ করে।

নামাযের মাঝে হৃদয়ের ব্যাকুলতা সৃষ্টি হওয়াও আবশ্যক। এর জন্যও মানুষের চেষ্টা করা উচিত। এ বিষয়েই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি উপায়ও বাতলে দিয়ে বলেছেন, নিজের চেহারায় কান্না-কান্না ভাব নিয়ে আসো; এই বাহ্যিক অবস্থাও অন্তরে প্রভাব ফেলে এবং তখন মানুষ সত্যিই কাঁদতে আরম্ভ করে। সুতরাং রসূলুল্লাহ্ (সা.) একদিকে যেমন আমাদের জানিয়েছেন যে, এ হলো আমার ইবাদতের মানদণ্ড এবং আমি কৃতজ্ঞ বান্দা; আল্লাহ্‌র অনুগ্রহই আমাকে রক্ষা করবে এবং সেই অনুগ্রহ লাভের জন্য আমি ইবাদতও করি এবং আল্লাহ্‌র নিয়ামতের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করি। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তো অমুখাপেক্ষী। আমি যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করি, তবে কে জানে– আল্লাহ্ তা'লা কী আচরণ করবেন! অতএব যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মতো ব্যক্তি, যিনি সকল পুণ্যবান মানুষের নেতা, স্বয়ং তিনিও আমলের অমুখাপেক্ষী নন, তখন অন্যরা কীভাবে অমুখাপেক্ষী হতে পারে? আর তারা কীভাবে বলতে পারে যে, 'আমরা আমলের আবশ্যকতা থেকে মুক্ত হয়ে গেছি, আমাদের আমলের দরকার নেই; আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা করে দেবেন'? এ তো কাফিরদের কথা, মু'মিনদের কথা নয়।

যিকরে ইলাহীও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর একটি সুন্নত। তিনি নিয়মিত যিকরে ইলাহী (তথা আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ) করতেন। এ বিষয়ে এক খুতবায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) উল্লেখ করেছেন, যিকরসমূহের মধ্যে এটিও অন্যতম যা ঘুমানোর সময় পড়া হয়। মহানবী (সা.) ঘুমানোর সময় আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস– কুরআন করীমের শেষ এই তিনটি সূরা তিনবার পাঠ করে হাতের ওপর ফুঁ দিতেন এবং সেই হাত নিজের শরীরে বোলাতেন। তিনি হাতের ওপর ফুঁ দিয়ে এমনভাবে শরীরে বোলাতেন যে, মাথা থেকে শুরু করে যতদূর পর্যন্ত হাত পৌঁছাত, ততদূর পর্যন্ত বোলাতেন। এটি তাঁর (সা.) সুন্নত। যে কাজকে তিনি (সা.) ধর্মীয় কাজ জ্ঞান করে নিয়মিত ও সর্বদা করতেন সেগুলোকেই সুন্নত বলা হয়। যেহেতু এই যিকরও তিনি নিয়মিত করতেন, অর্থাৎ আয়াতুল কুরসী ও তিনটি 'কুল' (ইখলাস, ফালাক, নাস) রাতে পড়া– তাই এই সুন্নতের অনুসরণ প্রত্যেক মুসলমানেরই করা উচিত; বরং এটিকে নিজ জীবনের অপরিহার্য অংশ বানানো উচিত।

অতএব এটি ভেবে যিকর ত্যাগ করা উচিত নয় যে, 'এটি তেমন জরুরি নয়, এটি না করলে জাহান্নামে যেতে হবে না'। আবার এ ধারণা করাও ঠিক নয় যে, 'এই যিকরই জান্নাতে নিয়ে যাবার জন্য যথেষ্ট, এর সাথে আর কোনো আমলের প্রয়োজন নেই'। যে

ফরযসমূহ রয়েছে সেগুলোও পূর্ণ করতে হবে। আমাকেও অনেকে চিঠি লেখেন এবং জিজ্ঞেস করেন, আমাদের জন্য কোনো ছোট্ট দোয়া বলে দিন, কোনো যিকর বলে দিন যা আমরা নিয়মিত করতে থাকব, যেন আমাদের ভেতর পুণ্য সৃষ্টি হয়, আমাদের পাপ দূর হয়ে যায়, আমাদের কাজকর্মও সহজ হয় এবং আমরা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যও লাভ করতে পারি। এর উত্তরে প্রথম কথা হলো ইবাদত, অর্থাৎ ফরয নামায। সেগুলোর পাশাপাশি রসূলুল্লাহ্ (সা.) ফরযের পর নফল নামাযও আদায় করতেন। অতএব, নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে হাজির হবার যে মানদণ্ড রয়েছে, তা আগে অর্জন করা প্রয়োজন। এরপর রয়েছে নফল ইবাদত, তারপর যিকরে ইলাহী। যিকর মানুষকে আরো বেশি পুণ্যের দিকে মনোযোগী করে তোলে, কিন্তু এর পাশাপাশি অন্যান্য নৈতিক গুণাবলি ও সৎকর্ম পালনও অপরিহার্য। মানুষের উচিত উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়া। আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ, নিজের সমস্যার সমাধান এবং দোয়া কবুল হবার জন্য আবশ্যক হলো আল্লাহ্ তা'লার সব আদেশ পালন করা, আর সেই আমল এমনভাবে করা যেভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের করে দেখিয়েছেন। এজন্য আন্তরিক চেষ্টা করা উচিত এবং এই পূর্ণাঙ্গ সুন্নতের ওপর আমল করা উচিত।

যাহোক, যিকরের বিষয়ে এই মনোভাব থাকা উচিত নয় যে, যিকর পরিত্যাগ করলে কেউ জাহান্নামে যাবে অথবা যিকরই কাউকে জান্নাতে নিয়ে যাবে অথবা এর মাধ্যমে আমাদের সকল সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। মোটকথা আমল আবশ্যক এবং ফরয কাজগুলো পালনও আবশ্যক। যেক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর ন্যায় মহামানব নিজ (আধ্যাত্মিক) উন্নতির জন্য এসব যিকরের মুখাপেক্ষী ছিলেন সেক্ষেত্রে আমরা কীভাবে একথা বলতে পারি যে, আমাদের এসব যিকরের প্রয়োজন নেই? মহানবী (সা.)-এর সুন্নত হলো, তিনি সদা ঘুমোনোর সময় আয়াতুল কুরসী এবং তিন কুল (সূরা এখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস) তিনবার করে পাঠ করতেন– যেমনটি একটু আগেও উল্লেখ করা হয়েছে, আর এরপর হাতে ফুঁ দিয়ে শরীরে হাত বোলাতেন।

হযরত মসুলেহ্ মাওউদ (রা.) আরো কিছু বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, যারা ধর্মীয় নেতা হন তাদের এই প্রবল খেয়াল থাকে যেন তাদের ইবাদত ও যিকর অন্য মানুষের তুলনায় বেশি হয়। ধর্মের কিছু এমন নেতাও আছেন যারা আলেম বা ধর্মীয় সংগঠনের প্রধান হিসেবে পরিচয় দেয়; তারা মনে করে, 'আমাদের ইবাদত অন্যদের চেয়ে বেশি হওয়া উচিত' এবং এজন্য তারা বিশেষভাবে কৃত্রিমতার আশ্রয় নেয় যেন মানুষ তাদের পুণ্যবান মনে করে। বড়ো বড়ো নেতা ও রাজনীতিবিদরাও এখন এটাই করতে শুরু করেছে, তাদের হাতে তসবিহ থাকে; মসজিদের ইমাম বা কোনো সংগঠনের পদাধিকারীগণ নিজেদেরকে জগতের জন্য আদর্শ মনে করে অথবা এটা বুঝাতে চায় যে, 'আমরা তোমাদের জন্য আদর্শ'। তারা মনে করে, তারা যেহেতু আদর্শ, তাই তারা লোক-দেখানো কৃত্রিমতা করে এবং বাহ্যিকভাবে এমন আচরণ প্রকাশ করে। মুসলমানদের মধ্যেও এই বিষয়গুলো আছে এবং অমুসলিম নেতাদের মধ্যেও তা দেখা যায়। কিছু গোত্রীয় প্রথাতেও এসব কথা পাওয়া যায়। যা-ই হোক, যদি মুসলমান হয় তবে তাদের নিজেদের জাহির করার বা নিজেদের অবস্থা প্রদর্শন করার ধরন এমন যে, যদি তারা অজু করে তবে বিশেষ আয়োজনের সাথে দীর্ঘক্ষণ ধরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধুতে থাকে; এমনকি এটাও বলে যে, অজু করার সময় যে পানির ফোঁটা পড়ছে তা-ও যেন শরীরে না লাগে, কারণ এতে অপবিত্রতা সৃষ্টি হয়; তারা সিজদা ও রুকুও

অনেক লম্বা করে এবং কেবল দেখানোর জন্য নিজেদের অবয়ব দিয়ে বিনয় ও নম্রতার ভাব প্রকাশ করে। যদি আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা পাবার জন্য করে থাকে তবে তা ভিন্ন কথা, কিন্তু এরা দুনিয়াকে দেখানোর জন্য এসব করে থাকে; মানুষের সামনে খুব দোয়া-দরূদ পড়বে, হাতে তসবিহ থাকে এবং প্রকাশ্য যিকর করতে থাকে; অথচ মহানবী (সা.) সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী ও পরহেযগার হওয়া সত্ত্বেও এবং কোনো মানুষ তাঁর সমপরিমাণ খোদাভীতি অর্জন করতে না পারা সত্ত্বেও তিনি (সা.) এসব বিষয়ে অত্যন্ত অনাড়ম্বর ছিলেন এবং তাঁর জীবন এই সব লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল।

হযরত আবু কাতাদা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, আমি অনেক সময় নামাযে দাঁড়াই এবং ইচ্ছা হয়– নামায দীর্ঘ করব; কিন্তু (ইতোমধ্যে) কোনো শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনতে পাই, তখন আমি আমার নামায এই ভয়ে সংক্ষিপ্ত করে দিই যে, পাছে আমি শিশুটির মাকে কষ্টে ফেলে দিই। কত-না সরলতার সাথে মহানবী (সা.) বলেছেন, আমি শিশুর আওয়াজ শুনে নামায দ্রুত শেষ করে ফেলি। আজকালকার সুফিরা তো এহেন উক্তিকে সম্ভবত নিজেদের মানহানি বলে মনে করবেন। তারা তো এ কথা প্রকাশ করার মাঝে নিজেদের গর্ব মনে করেন যে, আমরা নামাযে এমন মগ্ন থাকি যে কোনো খবরই থাকে না এবং যদি পাশে ঢোলও বাজতে থাকে তবুও আমাদের কোনো খেয়াল হয় না; অথচ মহানবী (সা.) এসকল লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত ছিলেন। তাঁর (সা.) শ্রেষ্ঠত্ব ছিল আল্লাহ্ তা'লার দানকৃত, মানুষ তাঁকে সম্মানিত বানায় নি। মানুষের কাছ থেকে তাঁর কিছুই পাবার ছিল না। তিনি খোদা তা'লার কাছ থেকে সম্মানের প্রত্যাশী ছিলেন। তাই তিনি (সা.) এসব বিষয় থেকে মুক্ত ছিলেন; এসব (লোক-দেখানো) চিন্তা তারাই করতে পারে যারা মানুষের দেওয়া সম্মানকে প্রকৃত সম্মান মনে করে। এই প্রদর্শনপ্রিয়তা কেবল সেসব লোকেরই হতে পারে যারা মানুষকে সম্মানদাতা মনে করে। যারা আল্লাহ্ তা'লাকে প্রকৃত সম্মানদাতা মনে করে, তারা কখনোই এমন চিন্তা করতে পারে না, যেমনটি মহানবী (সা.) সুন্নত কায়েম করেছেন এবং নিজের আমল দ্বারা প্রকাশ করেছেন। তাদের মাঝে সরলতা থাকে এবং থাকা উচিত।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, একবার তাকে অর্থাৎ হযরত আনাসকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, মহানবী (সা.) কি জুতোসহ নামায পড়তেন? এখন একপাশে ইবাদতসমূহ রয়েছে এবং উচ্চমান অর্জন করার বিষয়টি রয়েছে, কিন্তু যেখানে সহজসাধ্যতার প্রয়োজন সেখানে সাচ্ছন্দ্যও আছে। যেমন আমি আসরের নামাযের সময়ের ব্যাপারে বলেছি যে, মহানবী (সা.) প্রতিটি দিক সামনে রাখতেন। কিন্তু প্রকৃত বিষয় হলো, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত যেন দৃষ্টিপটে থাকে ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্য যেন সামনে থাকে। যাহোক, তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, মহানবী (সা.) কি জুতোসহ নামায পড়তেন? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, তিনি পড়তেন। এই ঘটনা থেকে জানা যায়, তিনি কীভাবে লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা থেকে বেঁচে চলতেন। যেসব মুসলমান ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে অনবগত, বরং এর শিক্ষা সম্পর্কেই অজ্ঞ, তারা যদি কাউকে জুতোসহ নামায পড়তে দেখে তবে শোরগোল শুরু করে দেবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ তাদের ধারণা অনুযায়ী সকল শর্ত পূরণ না করে ততক্ষণ তারা সহ্যও করতে পারে না। অথচ মহানবী (সা.) আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ; তাঁর পদ্ধতি ছিল, তিনি বাস্তব অবস্থাকে দেখতেন; লৌকিকতার পূজারী ছিলেন না। অবস্থা তো আজও এমনটিই। আমাদের জনৈক আহমদী আমাকে লিখেছে, তাকে একজন (অআহমদী) বলে যে, 'তুমি কলেমা পড়ছ' বা 'তুমি অমুক কথা বলেছ'; সে (তথা আহমদী) বলে,

‘তুমি তো নামাযই পড় না! তুমি নামাযও পড়তে জানো না কিংবা তুমি কুরআনও পড় না। তুমি এসবের কী বুঝবে? তোমার এসবের সাথে কী সম্পর্ক?’ সে বলে, ‘আমি (নামায) জানি বা না-ই জানি, কিন্তু তুমি যেহেতু আহমদী, মির্যায়ী বা কাদিয়ানী, তাই তোমার নামায পড়া উচিত নয় এবং তোমার নামায জানাও উচিত নয়’।

অতএব এটি আজকালকার মানুষের অবস্থা; তারা আমাদের বিরোধী, কিন্তু নিজেদের কোনো আমল নেই। যাহোক, আল্লাহ্ তা’লার ইবাদতের জন্য পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা শর্ত এবং এ কথা কুরআন করীম ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অতএব, যে জুতো পবিত্র এবং যা পরে অপবিত্রতা লাগার আশঙ্কাপূর্ণ সম্ভাব্য জায়গাগুলোতে যাওয়া হয় নি, প্রয়োজনে তা পরে নামায পড়ায় দোষের কিছু নেই। আর তিনি (সা.) এমনটি করে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ওপর এক বিশাল অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তাদের এই উত্তম আদর্শ থেকে উপকৃত হওয়া উচিত, যারা আজকাল এসব বিষয় নিয়ে ঝগড়া করে এবং লৌকিকতার ভক্ত। যে কাজের ফলে আল্লাহ্‌র মহিমা এবং তাকওয়ার কোনো ঘাটতি হয় না, তা করলে মানুষের ধার্মিকার ক্ষেত্রে কোনো ব্যাঘাত ঘটে না।

তারপর ইকামাতে সালাত বা নামায প্রতিষ্ঠাও একটি অত্যন্ত জরুরি বিষয় এবং এর মধ্যে নিজে নামায পড়া, অন্যদের পড়ানো এবং নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে পড়া, অজু অবস্থায় ধীরস্থিরভাবে বাজামা’ত এবং পূর্ণ শর্তাবলি মেনে নামায পড়া অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নামায আল্লাহ্ এবং বান্দার মধ্যে সাক্ষাতের একটি মাধ্যম, যেন এর মাধ্যমে ঐশ্বরিক সেই রঙ যা মহানবী (সা.)-এর দ্বারা আল্লাহ্ তা’লা সৃষ্টি করতে চান, তা মু’মিনদের মাঝে সৃষ্টি হয় এবং যেন তারা আল্লাহ্‌র রঙে রঙিন হয়ে যায়। মহানবী (সা.) বাজামা’ত নামাযের বিষয়ে এতটাই গুরুত্ব দিতেন যে, একবার তাঁর কাছে একজন অন্ধ ব্যক্তি আসেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! আমার বাড়ি মসজিদ থেকে অনেক দূরে এবং যেহেতু মসজিদে পৌঁছাতে আমার অনেক কষ্ট হয়, তাই আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি বৃষ্টির দিনগুলোতে নিজের বাড়িতেই নামায আদায় করে নিতে পারি। মদীনায় মাটির ঘর ছিল, বৃষ্টির কারণে অলিগলিতে পানি জমে যেত এবং ঘরের দেয়াল ঘেঁষে চলতে হতো; কিন্তু সেখানে দেয়ালকে বৃষ্টির পানি থেকে বাঁচানোর জন্য এই প্রথা ছিল যে, দেয়ালের সাথে পাথর গেঁথে রাখা হতো যেন বৃষ্টির পানি দেয়ালে লেগে কাঁচা দেয়ালের ক্ষতি করতে না পারে। অন্ধ সাহাবী বলেন, আমি পানির কারণে রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলতে পারি না, আর কিনার দিয়ে চললে আমি যেহেতু দেখতে পাই না, সেহেতু সেখানে পায়ে পাথরের আঘাত লাগার, আহত হওয়া বা পড়ে যাবার ভয় আছে; তবে কি আমি বাড়িতে নামায আদায় করে নেব? মহানবী (সা.) বলেন, ঠিক আছে, পড়তে পারো; যদি তোমার এই সমস্যা থাকে তবে কোনো ক্ষতি নেই। তিনি যখন সেখান থেকে চলে গেলেন, তখন কিছুক্ষণ পর তিনি (সা.) সাহাবীদের বলেন, তাকে একটু ডেকে নিয়ে এসো। তিনি যখন ফিরে আসেন তখন মহানবী (সা.) জিজ্ঞাসা করেন, তোমার বাড়িতে কি আযানের আওয়াজ পৌঁছায়? তিনি নিবেদন করেন, জি হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আযানের আওয়াজ তো পৌঁছে যায়। তখন তিনি (সা.) বলেন, যদি আযানের আওয়াজ তোমার ঘরে পৌঁছায় তবে মসজিদে আসার সময় যদি হোঁচট খেতে হয় কিংবা আহত হতে হয়, তবুও তোমার অবশ্যই মসজিদে আসা উচিত।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমি আবারও বলছি, আল্লাহ্‌র ভালোবাসার বৃক্ষসমূহ তাদের হৃদয়ে উৎপন্ন হয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং তাতে এমন সুমিষ্ট ও পবিত্র ফল ধরবে যা 'উকুলুহা দায়িমুন' (অর্থাৎ তার ফলসমূহ চিরস্থায়ী)-এর প্রতিচ্ছবি হবে। মনে রেখো, এটিই সেই স্তর যেখানে সুফিদের আধ্যাত্মিক ভ্রমণের (সুলুক) পরিসমাপ্তি ঘটে; যখন কোনো পথিক (সালেক) এখানে পৌঁছায়, তখন সে কেবল খোদারই জ্যোতি প্রত্যক্ষ করে। তিনি (আ.) বলেন, 'তাআব্বুদ'-এর অবস্থা তথা ইবাদতের অবস্থার সংশোধন বা যথার্থতাই হলো প্রকৃত ইবাদত। এমন অবস্থা যেখানে আল্লাহ্ তা'লার কথা স্মরণ থাকে এবং তাঁর ইবাদত করার সময় আল্লাহ্ তা'লাই সামনে থাকেন, সেটিই হলো প্রকৃত ইবাদত। তিনি বলেন, إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (সূরা হুদ: ৩) অর্থাৎ "আমি তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে সতর্ককারী এবং সুসংবাদদাতা।"

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, যেহেতু এই 'তাআব্বুদে তাম' তথা পূর্ণাঙ্গীণভাবে ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করার কাজ এক অতি মহান কাজ, মানুষ কোনো উত্তম আদর্শ এবং নিখুঁত নমুনা ছাড়া এটি করতে পারে না, কোনো পবিত্রকরণ শক্তির পূর্ণ প্রভাব ছাড়া কেউ এটি করতে পারে না, এই কারণেই মহানবী (সা.) বলেছেন, আমি সেই খোদার পক্ষ থেকেই সতর্ককারী এবং সুসংবাদদাতা হিসেবে এসেছি; যদি তোমরা আমার আনুগত্য করো এবং আমাকে কবুল করো, তবে তোমাদের জন্য বিরাট সব সুসংবাদ রয়েছে, কারণ আমি 'বাশির' (তথা সুসংবাদদাতা)। আর যদি প্রত্যাখ্যান করো, তবে মনে রেখো আমি 'নাযির' (তথা সতর্ককারী) হয়ে এসেছি; তখন তোমাদেরকে বড়ো বড়ো শাস্তি ও দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হতে হবে।

সুতরাং এটিই সেই বিষয় যা আমাদের গভীরভাবে দেখা উচিত। আমরা যখন মহানবী (সা.)-এর উত্তম আদর্শ অনুসরণ করে তাঁকে মেনে নিয়েছি, তখন তাঁকে সুসংবাদদাতা হিসেবেই মেনে নিয়েছি। আর সেই সুসংবাদসমূহ আমরা তখনই অর্জন করতে পারব যখন আমরা আমাদের ইবাদতের হক আদায়কারী হবো এবং তাঁর আদর্শ অনুসরণের জন্য সেই মান অর্জনের চেষ্টা করব। মনে রাখতে হবে, এই প্রচেষ্টার জন্য কুরবানী বা আত্মত্যাগ করতে হয়, জিহাদ (সংগ্রাম) করতে হয়। কিছু মানুষকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলে, 'আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার চেষ্টা করি'। এটি আত্মপ্রবঞ্চনা। যদি প্রকৃতই চেষ্টা করা হয়, তবে মনে এক উদ্‌বেগ থাকে। অতএব, আমাদের প্রত্যেকের আত্মপর্যালোচনা করা প্রয়োজন যে, আমাদের এই চেষ্টাগুলো প্রকৃত চেষ্টা কি না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, মহানবী (সা.)-এর ইবাদত কেমন ছিল? তিনি হেরা গুহায় চলে যেতেন, যেখানে বন্যজন্তু, সাপ এবং চিতা বাঘের ভয় ছিল। এর উল্লেখ আগেও করা হয়েছে যে, সেখানে গিয়ে তিনি দোয়া করতেন। এই বিষয়টি বর্ণনা করে তিনি (আ.) বলেন, এটি একটি সাধারণ নিয়ম যে, যখন একদিকের আকর্ষণ খুব বেড়ে যায়, তখন অন্যদিকের ভয় মন থেকে দূর হয়ে যায়। যখন আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসার আকর্ষণ বেড়ে যায় এবং তাঁর ইবাদতের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ হয়, তখন অন্যান্য জাগতিক জিনিসের ভয় দূর হয়ে যায়। তিনি উদাহরণ দিয়েছেন যে, অনেক মহিলা যাদের প্রকৃতি অত্যন্ত ভীরু হয়, দেখা গেছে যে, নিজ সন্তানের অসুস্থতার সময় অন্ধকার রাতে প্রয়োজনে তারা এমন জায়গায় চলে যায় যেখানে দিনের বেলা যাওয়াও তাদের জন্য কঠিন। তিনি (আ.) বলেন, যখন ঐশী ভয় এবং ভালোবাসা প্রবল হয়, তখন বাকি সব ভয় এবং ভালোবাসা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এমন দোয়ার জন্য নির্জনতাও প্রয়োজন; এমনই পূর্ণ সম্পর্কের সাথেই নূর বা

জ্যোতি প্রকাশিত হয়। আর প্রতিটি সম্পর্কের জন্য একটি 'সতর' বা আবরণ প্রয়োজন হয়; অর্থাৎ সম্পর্ক যখন গোপন হয় তখনই তা (তথা নূর) প্রকাশিত হয়। তিনি (আ.) বলেন, ইবাদত শুধুমাত্র খোদা তা'লার জন্যই হওয়া উচিত, লোক-দেখানোর জন্য যেন না হয়। আনুগত্য, ইবাদত ও সেবার ক্ষেত্রে যদি ধৈর্য অবলম্বন করো, তাহলে খোদা কখনোই তা বৃথা যেতে দেবেন না। ইসলামে এমন হাজার হাজার মানুষ গত হয়েছেন যাদেরকে মানুষ কেবল তাদের নূর দেখেই চিনে ফেলেছে। তাদের জন্য প্রতারকদের মতো গেরুয়া কাপড় বা লম্বা জোব্বা এবং বিশেষ কোনো স্বাতন্ত্র্যসূচক পোশাকের প্রয়োজন নেই। আর খোদার সত্যবাদী বান্দারা এমন কোনো উর্দিতে সজ্জিতও হন নি যে, তারা জোব্বা পরে ভাববেন– তারা বড়ো ফকির, বড়ো সুফি বা বড়ো পুণ্যবান। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর এমন বিশেষ কোনো পোশাক ছিল না যা দিয়ে তিনি মানুষের মধ্যে স্বতন্ত্র হতে পারতেন; বরং একবার তো এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রা.)-কে মহানবী (সা.) মনে করে তাঁর সাথে করমর্দন করতে থাকেন এবং সম্মান প্রদর্শন শুরু করেন। অবশেষে হযরত আবু বকর (রা.) উঠে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-কে পাখা দিয়ে বাতাস করতে শুরু করেন এবং নিজের মুখের কথায় নয় বরং কাজের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেন যে, মহানবী (সা.) হলেন ইনি! আমি তো কেবল একজন সেবক। যখন মানুষ খোদার ইবাদত করে, তখন তার রঙিন কাপড় পরা, একটি বিশেষ অবয়ব তৈরি করা এবং মালা ইত্যাদি ঝুলিয়ে চলার কী প্রয়োজন? [অর্থাৎ যারা গলায় তসবিহর মালা পরে এবং হাতে লম্বা লম্বা তসবিহ নিয়ে রাখে;] এমন লোক দুনিয়ার কুকুরসদৃশ। এরা তো দুনিয়াদার মানুষ, খোদাপ্রেমিক নয়। খোদার অন্বেষণকারীদের এতটুকু হুঁশ কোথায় যে, তারা পোশাক এবং উর্দির বিশেষ আয়োজন করবে? তারা তো লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে চান। ক্ষেত্রবিশেষে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ঐশী প্রজ্ঞার অধীনে কাউকে বাইরে টেনে আনেন যেন তাঁর উলুহিয়্যত বা ঈশ্বরত্বের প্রমাণ দিতে পারেন।

মহানবী (সা.)-এর মোটেও এই আকাঙ্ক্ষা ছিল না যে, মানুষ তাঁকে পয়গম্বর বলুক এবং তাঁর আনুগত্য করুক; আর একারণেই তিনি সেই হেরা গুহায়, যা কবরের চেয়েও সংকীর্ণ ছিল, সেখানে গিয়ে ইবাদত করতেন। আর তাঁর মোটেও এ সংকল্প ছিল না যে, সেখান থেকে বাইরে আসবেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা নিজ প্রজ্ঞার অধীনে তাঁকে বাইরে নিয়ে আসেন এবং তাঁর মাধ্যমে জগতের সামনে নিজের নূর প্রকাশ করে দেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সেই নূর থেকে কল্যাণ লাভের তৌফিক দান করুন; আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের হক আদায় করার তৌফিক যেন আমরা লাভ করি এবং তাঁর (সা.) উত্তম আদর্শ অবলম্বনের সামর্থ্য লাভ করি; আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাঁর (সা.) উত্তম আদর্শ অনুযায়ী চলার এবং প্রকৃত অর্থেই তা আত্মস্থ করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)